সর্বগ্রাসী অপ-‘বাদ’ বনাম একজন আরজ আলী মাতুব্বর

রণদীপম বসু

দার্শনিক, না শিশু?

শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ছোট্ট শিশুটি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো চাঁদটা গোল কেন? আমরা যারা ইতোমধ্যে বড় হয়ে গেছি, প্রশ্ন শুনেই নড়েচড়ে ওঠি। তখন আর ঠিক মনে করতে পারি না আমরাও কি এমন প্রশ্ন করেছিলাম শৈশবে? সৃষ্টির শুরুতে একান্ত তরল প্রকৃতির মহাজাগতিক একটা বস্তুপিণ্ডের তীব্রগতির ঘুর্ণায়মান অবস্থায় মহাকর্ষের কেন্দ্রাভিগ আর কেন্দ্রাতিগ বলের সম্মিলিত প্রভাবের সাথে অন্যান্য অনুঘটক মিশে বস্তুর আকৃতি প্রকৃতই গোল হয়ে যাবার ধারণাটা যারা প্রশ্ন খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেছেন তাদের কথা আলাদা। একটা শিশুর পক্ষে তা বুঝার বা তাকে বুঝানোর প্রেক্ষিতও এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বটা অন্যত্র। আমরা যারা এই চাঁদটাকে গোল দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, পূর্ণিমার চাঁদ তো গোলই। এখানে বিস্ময়ের কী আছে! বিস্ময়ের কিছুই খুঁজে পাই না আমরা। তাই চাঁদ কেন গোল, এটাও যে একটা কৌতূহলী প্রশ্ন হতে পারে সেই বোধটাই মরে গেছে আমাদের। এমন হাজারো লক্ষ অভ্যস্ততার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে বিস্ময়হীন কৌতূহলহীন এই আমরা আসলে এক প্রশ্নহীন অন্ধধারণার বশংবদ প্রাণীই এখন; জিজ্ঞাসু মানুষ নই; দার্শনিক তো দূরের কথা। ব্যাখ্যাহীন পূর্ব-সংস্কারের গড্ডালিকায় নিমজ্জিত আমাদের সুসভ্য চেহারার ভেতরে অন্তর্গত উপলব্ধিটা যে কতো অন্ধকার কালোয় ডুবে আছে, সেই বোধটুকুও হারিয়ে বসে আছি অধিকাংশেই। এর ফল যা হবার তাই হয়েছেÑ কোন অনাচারেই আর আশ্চর্য হই না আমরা। অলৌকিক নামে লৌকিক কৌশলজাত কিছু মিথ্যাচার, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং চিরাচরিত প্রথার কাছে প্রশ্নহীন আনুগত্য দিয়ে খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমাচ্ছি আর ফলন বাড়াচ্ছি এক অথর্ব প্রজাতির। অথচ একটু কাণ্ডজ্ঞান খরচ করলেই প্রত্যেকটা মানুষই হতে পারতো একেক জন সম্ভাব্য লোক-দার্শনিক। কীভাবে?

‘ভালো দার্শনিক হওয়ার জন্যে একমাত্র যে-জিনিসটি আমাদের প্রয়োজন তা হলো বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা।

শিশুদের এই ক্ষমতাটি আছে। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মাতৃগর্ভে অল্প কটা মাস কাটিয়ে তারা একেবারে নতুন এক বাস্তবতার মধ্যে এসে পড়ে। কিন্তু তারা যখন বড় হয় তখন এই বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাটি যেন নষ্ট হয়ে যায়। কেন এমনটা হয়?...

একটি সদ্যোজাত শিশু যদি কথা বলতে পারত তাহলে হয়ত যে অসাধারণ বিশ্বে সে এসে পড়েছে সেই বিশ্ব সম্পর্কে কিছু কথা জানাতে পারত। কীভাবে সে চারদিকে তাকায় আর যা কিছু দেখে সেদিকেই কীভাবে কৌতূহলের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেয় সে, তা তো আমরা প্রায়ই দেখে থাকি।...

কিন্তু শিশুটি ভালো করে কথা শেখার অনেক আগেই এবং দার্শনিকভাবে চিন্তা করতে শেখার অনেক আগেই পৃথিবীটা একটা অভ্যাসে পরিণত হবে তার।...

ব্যাপারটা রীতিমত দুঃখজনক... পৃথিবীর ব্যাপারে অতি অভ্যস্ততার কারণে এর সঠিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে যারা অক্ষম হয়ে পড়ে...

মনে হয় যেন বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি চলার সময় আমরা বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাটি হারিয়ে ফেলি। আর তাতে করে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু হারিয়ে ফেলি আর সেই হারিয়ে ফেলা জিনিসটিই ফের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন দার্শনিকেরা। কারণ, আমাদের ভেতরে কোথাও থেকে কিছু একটা বলে ওঠে যে, জীবন এক বিশাল রহস্য। আর ঠিক এই ব্যাপারটিই আমরা উপলব্ধি করেছিলাম অনেক আগে, যখন এই কথাটি আমরা ভাবতে শিখিনি।

আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে: দার্শনিক প্রশ্নগুলো আমাদের সবাইকেই ভাবিত করলেও আমরা সবাই কিন্তু দার্শনিক হই না। নানান কারণে বেশিরভাগ লোকই প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে এমনই বাঁধা পড়ে যায় যে বিশ্ব সম্পর্কে তাদের বিস্ময় এসবের আড়ালে চলে যায়।

বাচ্চাদের কাছে এই বিশ্ব আর তার সমস্ত কিছুই নতুন; এমন একটা কিছু যা দেখে বিস্ময় জাগে। বড়োদের কাছে ব্যাপারটা সে-রকম নয়। বিশ্বটাকে বড়োরা একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ধরে নেয়।

ঠিক এই জায়গাটাতেই দার্শনিকেরা এক বিরাট ব্যতিক্রম। একজন দার্শনিক কখনোই এই বিশ্বের ব্যাপারে ঠিক পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন না। তিনি পুরুষ বা নারী যা-ই হোন না কেন, তাঁর কাছে বিশ্বটা খানিকটা অযৌক্তিক বলে ঠেকতে থাকেÑ মনে হতে থাকে হতবুদ্ধিকর, এমনকী হেঁয়ালিভরা। দার্শনিক আর ছোট্ট শিশুদের মধ্যে তাই একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় খুব মিল। সারা জীবন একজন দার্শনিক একটা শিশুর মতোই স্পর্শকাতর রয়ে যান।'

(সোফির জগৎ / ইয়স্তেন গার্ডার / অনুবাদ: জী এইচ হাবীব)

তাই দর্শন সম্ভবত শেখার কোন বিষয় নয়; বরং দার্শনিকভাবে চিন্তা করাটাই শেখার বিষয় হতে পারে।

কে হবে প্রশ্নকর্তা?

দার্শনিক চিন্তাসূত্র অনুযায়ী জ্ঞান বা জিজ্ঞাসা বিবেচনায় জগতে চিন্তাশীল সত্ত্বা চার ধরনের হতে পারে

(এক) যে জানে যে, সে সব জানে

(দুই) যে জানে যে, সে কিছুই জানে না

(তিন) যে জানে না যে, সে সব জানে

(চার) যে জানে না যে, সে কিছুই জানে না।

'যে জানে যে, সে সব জানে' এমন কাল্পনিক সত্ত্বার অস্তিত্ব আদৌ সম্ভব কি না, নিশ্চিতভাবেই তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। এই অসীম মহাবিশ্ব চরাচরে সংখ্যারহিত পরিমাণে বিশাল থেকে অতিক্ষুদ্র এই অনন্ত সংখ্যক বিষয়-বস্তু-ঘটনাপুঞ্জের সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংশ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজনিত কার্য-কারণের দৃশ্যমান-অদৃশ্য সম্ভব-অসম্ভব অনন্ত-অনাদি মহাসমীকরণের কল্পনারহিত প্রতিটি একক যুগ্ম গোষ্ঠী বা সামগ্রিক প্রেক্ষিতের প্রেক্ষাপট ধারণ করার মতো কাল্পনিক সত্ত্বার অস্তিত্ব কল্পনাতেও কি সম্ভব? জানার যেমন কোন সীমা নেই, তেমনি সীমাহীন জানার বিষয়টিও যৌক্তিক কারণেই যুক্তিহীন। তাই বলা যেতে পারে- যে জানে যে সে সব জানে, এমন সত্ত্বার অস্তিত্ব কেবল যুক্তিপরম্পরাহীন দার্শনিক কল্প-ধারণা মাত্র।

'যে জানে যে, সে কিছুই জানে না' দর্শনের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এটি। এ ক্ষেত্রে যাঁর কথা সর্বাগ্রে চলে আসে তিনি গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রি. পূ.)। সমগ্র দর্শনের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে রহস্যময় ব্যক্তিই তিনি। জীবদ্দশায় একটি বাক্যও লেখেন নি । তারপরেও ইউরোপিয় চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে বড় প্রভাব আর কেউ ফেলতে পারেন নি।

'আমি কেবল একটা কথাই জানি আর সেটা হলো আমি কিছুই জানি না' নিজের স্বপক্ষে এ কথাটা বলেই তিনি শুধু প্রশ্ন করে যেতেন, বিশেষ কোনো একটা আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে, যেন তিনি বিষয়টা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। যাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন তাদের তিনি এমন একটা ধারণা দিতেন যে আসলে তিনি তাদের কাছ থেকে শিখতে চাইছেন। প্রশ্নটাই ছিলো তাঁর যুক্তির ধারালো হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে তার যুক্তির দুর্বলতা বা অসারতা বুঝিয়ে দিতেন আর তখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায়।

প্রকৃতপক্ষে জানার স্বপক্ষে বাড়িয়ে দেয়া প্রতিটা কার্যকর ধাপে কৌতূহলী ব্যক্তি মূলত নিজের অজ্ঞানতাকেও আরেক ধাপ চিহ্নিত করার প্রয়াস পান। অর্থা নিত্য নতুন জানার মাধ্যমে নিজের অজ্ঞানতাই খুঁজে বেড়ান তাঁরা। এভাবে নতুন নতুন জ্ঞানে তাঁদের কৌতূহল আরো বেশি করে উসাহী হতে থাকে আরো নতুন নতুন জ্ঞানের দিকে। কেননা তিনিই জ্ঞানী যিনি তাঁর অজ্ঞানতাকে আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারই জ্ঞান। জানা-কে আবিষ্কার করেন যত, ততই না-জানা'র বিপুলতা সম্বন্ধে সচকিত ও বিহ্বল হয়ে ওঠেন তাঁরা। তাই, যে জানে যে সে কিছুই জানে না, সে-ই সবচেয়ে জ্ঞানী; জ্ঞান অন্বেষণে জানার অদম্য ইচ্ছাই তাঁকে নিরন্তর প্রশ্নমুখি করে তোলে।

প্রশ্নময় কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সক্রেটিস যে শুধু জ্ঞানী'র সংজ্ঞাটাই নির্ধারণ করে দেন তা-ই নয়, উল্টো, মূর্খামীর মুখোশটাও ছিঁড়ে ফেলেন একই যুক্তিতে যে জানে না যে সে কিছুই জানে না। আমরা অধিকাংশই তো সেই মূর্খের দলে, যারা ভান করে যে তারা অনেক কিছুই জানে; অথচ নিজের কাণ্ডজ্ঞানটাও ব্যবহার করতে জানে না। তারা যে কিছুই জানে না, সেই বোধটাও তাদের নেই। অথচ দর্শনগত সত্যগুলো প্রত্যেকেই বুঝতে পারে স্রেফ যদি তারা তাদের সহজাত কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে যুক্তিবোধটাকে ব্যবহার করে। সহজাত যুক্তি ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে নিজের মনের গভীরে পৌঁছে সেখানে যা আছে তা ব্যবহার করা। নিজে অজ্ঞ সেজে সক্রেটিস লোকজনকে তাদের কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করতে বাধ্য করতেন। কিন্তু কুসংস্কারে ডুবে থাকা সমাজের ক্ষমতাসীন প্রাতিষ্ঠানিক মূর্খতা লোকজনের কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করার সুযোগ দেবে কেন?

তাই আড়াই হাজার বছর আগের ক্ষমতাসীন প্রতিষ্ঠান যেমন সক্রেটিসকে বাধ্য করেছিলো হেমলকের তীব্র বিষ পান করতে, তেমনি বহুকাল পরে এসেও আমাদের বরিশালের গণ্ডগ্রামে প্রশ্ন করতে জানা স্বশিক্ষিত এক কৃষক দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরকেও প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে এই তখত প্রতিষ্ঠানই 'পবিত্র হাজতবাসে' নিক্ষিপ্ত করে। এতে করে কি প্রশ্ন থেমে গেছে? প্রশ্নের প্রাকৃতিক শক্তিই প্রশ্নকে চিরকাল শক্তিশালী করে রাখে।

তৃতীয় পর্যায়ের যে দার্শনিক সত্ত্বা যে জানে না যে সে সব জানে, এটাও হেঁয়ালিপূর্ণ একটা দার্শনিক বিভেদ মাত্র। যে জানে, অথচ এ বিষয়টাই সে জানে না এরকম কাঁঠালের আমসত্বের স্বাদ কল্পনাতেই সম্ভব, বাস্তবে নয়।

অতএব, প্রাথমিকভাবে উপস্থাপিত দার্শনিক সত্ত্বার যে চারটি ধারণা উপস্থাপিত হয়েছে, যুক্তি পরম্পরায় এসে চূড়ান্ত ফলাফলে দাঁড়ায়

এক) যে জানে যে, সে সব জানে > একটা অসম্ভব কল্পনা বা কাল্পনিক অস্তিত্ব

দুই) যে জানে যে, সে কিছুই জানে না > জ্ঞানীর বিজ্ঞতা

তিন) যে জানে না যে, সে সব জানে > অবাস্তব

চার) যে জানে না যে, সে কিছুই জানে না > মূর্খের অজ্ঞতা।

অর্থা এই সৃষ্টিজগতে দু'টো সত্ত্বাই কেবল ক্রিয়াশীল। জ্ঞানী আর মূর্খ। জ্ঞানী মাত্রেই তাঁর মধ্যে একটা বিস্ময়বোধসম্পন্ন দার্শনিক সত্ত্বা ক্রিয়াশীল থাকবে। কার্যকারণ ভিত্তিক যুক্তির তীব্র রশ্মি দিয়ে সব কিছুকেই প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণে উদ্যোগি থাকেন এঁরা; ন্যায় ও অন্যায়কে পার্থক্য করেন। আর যারা কাণ্ডজ্ঞানহীন অজ্ঞান বা মূর্খ, তাদের দুর্ভাগ্য যে, তারা এটাও জানে না যে তারা মূর্খ! ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করবে কোত্থেকে!

কী সেই প্রশ্ন

বিষয়ের মধ্যে বিষয় খুঁজে না পাওয়াটাই বোধ করি দর্শনের একটি বহুল আলোচিত বিষয় বা চিরায়ত দার্শনিক জটিলতাও। কথাটা হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হলেও হাস্যকর নয় কিছুতেই। কেননা চলতে ফিরতে আমরা আমাদের সাদাসিধে যাপন প্রণালীর মধ্যেও এরকম দার্শনিক হাপরে পতিত হই মাঝেমধ্যেই। একটা সংবেদনশীল ও গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে হয়তো আলোচনা করতে হবে, চিন্তাসূত্র গাথার প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবতে ভাবতে বিষয়ের এতো অগুনতি ডালপালা গজিয়ে যায় যে শেষপর্যন্ত কোথা থেকে কীভাবে শুরু করতে হবে তা নির্বাচন করাটাই একটা জটিলতর সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। যেখান থেকে শুরু করলে সুরাহার খুব সুন্দর একটা উপায় হয়তো বের হয়ে আসতে পারতো, সেটা না হয়ে ভুল পথে পা দিয়ে আষ্ঠেপৃষ্টে পেঁচিয়ে নিজেকে হতবিহ্বল করে তুলছি। হয়তো মাঝপথে ক্ষান্ত দিয়ে ফের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে হচ্ছে। এবং আবারো ওই

একই সমস্যা; কোত্থেকে শুরু করবো? অর্থাৎ অন্বিষ্ট বিষয়ের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান যে অসংখ্য বিষয়ের সমাহার, তা থেকে উপযুক্ত বিষয়টিকে নির্বাচন করা বা তুলে আনাটাই মূলত একটা সম্ভাব্য সহজ প্রক্রিয়ার জটিল প্রারম্ভ-সূচক হয়ে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কেন এমন হয়? এর যথাযথ উত্তর হয়তো এটাই যেÑ যথাযথ প্রশ্নটি করতে পারছি না আমরা। কেন পারছি না? হয়তো প্রশ্ন করার উপায়টাই জানা নেই আমাদের, তাই।

জগতের সমস্ত উত্তরই না কি নিহিত থাকে উ□ক্ষিপ্ত প্রশ্নের মধ্যেই। বলা হয়ে থাকে যিনি প্রশ্ন করতে জানেন, উত্তর তাঁকেই এসে ধরা দেয়। এবং প্রতিটা উত্তর হয়ে ওঠে ফের আরেকটা প্রশ্নের নিয়ামক সূত্র। এমনি করেই প্রশ্ন-উত্তর-প্রশ্ন-উত্তর-প্রশ্নের এই যে পর্যায়ক্রমিক বুনন প্রক্রিয়া, সেই সূচনা লগ্ন হতে কালক্রমে বয়ে বয়ে মানব-সভ্যতার অবারিত চিন্তা-জগতে তা-ই আজ সর্বব্যপ্ত হয়ে এক দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকেই কি দর্শন বলে? দর্শনের সংজ্ঞা নিরূপনের চাইতে বরং দর্শনের সাথে পরিচিত হওয়াটাই বোধ করি অধিকতর সহজ উপায়।

দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে দর্শন বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন করা, অনাদিকাল ধরে যে সব প্রশ্ন করে আসছে মানুষ। এবং সম্ভবত মানুষের আদি দার্শনিক প্রশ্নগুলোর মধ্যে দু'টো প্রশ্নই অত্যন্ত মৌলিক মানুষ কী, পৃথিবীটা কোথা থেকে এসেছে? কেবল এ দু'টো প্রশ্নই মানব সভ্যতার আদি দর্শনের ভিতটাকে গড়ে দিয়েছিলো বিপুলভাবে। পৃথিবীতে খুব সম্ভব এমন কোন সংস্কৃতি নেই যেখানে এ প্রশ্ন দু'টো উত্থাপিত হয় নি। এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই আদি মানবগোষ্ঠীর কল্পনাশক্তির সৃজনক্ষমতায় চম□কার সব দৃষ্টান্ত হয়ে আছে হাজারো দেব-দেবী বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনীর মায়াবী জগ□গুলো। মানুষের কল্পনা-ক্ষমতা যে কতো অফুরন্ত হতে পারে তার সাক্ষা□ প্রমাণ পেয়ে যাই আমরা এগুলো পাঠ করলে। এখন প্রশ্ন আসে, কল্পনা কী? সমকালীন বাস্তবতায় যে প্রশ্নের উত্তর সাধারণত মেলে না তাকে কিছু উদ্ভাবনীমূলক ধারণাসৃষ্ট কাহিনী পরম্পরায় সাজিয়ে উত্তর খোঁজার আপাত স্বস্তি-প্রয়াসই কল্পনা। তাহলে প্রশ্ন চলে আসবে, ধারণা কী? এমনি করে সূত্র থেকে সূত্র ধরে একটার পর একটা প্রশ্নের তোরণ পেরিয়ে এক অনির্দিষ্ট তথা অভূতপূর্ব গন্তব্যের দিকে এই যে আপাত অনিশ্চি□ ছুটে যাওয়া, এটাকে কী বলবো আমরা? কেউ কেউ বলেন 'যুক্তি'। পৃথিবী কী করে সৃষ্টি হয়েছে? যা ঘটে তার পেছনে কি কোন ইচ্ছা বা অর্থ রয়েছে? মৃত্যুর পরে কি জীবন রয়েছে? কীভাবে জীবন যাপন করা উচি□ আমাদের? এরকম হাজারো প্রশ্নের সংগতিকে অসংখ্য যুক্তি আর যুক্তিহীনতা দিয়ে যে যার মতো ধারণ করেছে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ভিত্তিক আদি মানবগোষ্ঠীর স্বকল্প গড়া উপাখ্যানগুলো। কালে কালে একদিন সভ্যতার মধ্যযুগে এসে তা থেকেই উ□পত্তি হয়ে গেলো 'ধর্ম' নামক বিচিত্র এক জটিল তত্ত্ব বা অদ্ভুত ধারণার। আর তখনি প্রশ্ন ওঠে, ধর্ম কি যৌক্তিক, না অযৌক্তিক?

প্রশ্নের হুমকী

প্রশ্ন কি হুমকী হয় কখনো? হয়; প্রশ্ন হুমকী হয় মিথ্যার কাছে। কেন? মিথ্যার কোন সত্যনিষ্ট ভিত্তি থাকে না। প্রশ্নের শক্তির কাছে মিথ্যার ফানুস টিকতে পারে না, চুপসে যায়। বাইরের চকমকি চেহারার ভেতরে

ভিত্তিহীন অবলম্বনগুলো মুহুর্মূহু প্রশ্নের ধাক্কায় ভেঙে গেলে মিথ্যার সৌধটা হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়ে। তাই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত কোন তত্ত্ব বা মতবাদ সমূহ প্রশ্নকেই বেশি ভয় পায়। তার অস্তিত্বের উপর হুমকী বলে প্রশ্নকারীকেই সে সবচেয়ে বড় শত্র" মনে করে। এসব মিথ্যা-বাদের অনুসারীরা তক্কে তক্কে থাকে প্রশ্নকারীর মুখটাকে রুদ্ধ করে দিতে। তার প্রমাণ সেই সক্রেটিস থেকে শুরু করে লিওনার্দো ব্র"নো, গ্যালিলিও হয়ে আমাদের আরজ আলী মাতুব্বর এবং হালের হুমায়ুন আজাদ। তাঁদের অপরাধ তাঁর চলমান ও প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা মতবাদকে প্রশ্নের মুখোমুখি করে মিথ্যা অস্তিত্বে নাড়া দিয়েছেন।

এই যে প্রশ্নকে এতো ভয় তাদের, প্রশ্নের শক্তিটা কী? প্রশ্নের শক্তি হচ্ছে উত্থিত যুক্তি। এটা সেই যুক্তি, যে কোন সীমানা মানে না। সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির এসিড টেষ্টে গলিয়ে গলিয়ে কার্যের পেছনে কারণ এবং তারও পেছনের সূচনা-বিন্দুকে খুঁজে বের করতে সদা উদ্যত সে পিছপা হয় না। কেবল যুক্তিই তো পারে সব ছিঁড়ে ফেড়ে জগতের সবচেয়ে নির্মম ও মৌলিক প্রশ্ন-দুটো নির্দ্বিধায় ছুঁড়ে দিতে কী, এবং কেন?

মানবগোষ্ঠীর সূচনালগ্ন থেকেই প্রাথমিক বিস্ময় নিয়ে সৃষ্টির উ□স খোঁজায় উদ্যোগি হয়েছেন আমাদের বুদ্ধিমান পূর্বসূরিরা, যাঁদেরকে আজ আমরা জ্ঞানী ও দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি। জ্ঞানে বিজ্ঞানে অগ্রগামী এসব গুণী দার্শনিক বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই মানব সভ্যতাকে সেই আদি থেকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নিতে ব্রতী হয়েছে। তাই গতকাল পর্যন্ত যে জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এসে মানুষের সমকালীন অভিজ্ঞতায় যুক্ত হলো, এই সর্বশেষ অর্জনও পরবর্তি অন্বেষায় হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক সূত্র। এভাবে যে কোন যুগে বা কালে সমকালীন জ্ঞানস্তরই সে সময়ের চিন্তারাজ্যে কোন তত্ত্ব বা মতবাদ প্রচার ও বিশ্লেষণের যৌক্তিক মানদণ্ড হিসেবে গৃহিত হয়েছে।

তাই বিভিন্ন সময়ে জন্ম নেয়া ধর্মতত্ত্বগুলো সে সময়কালের বাস্তবতা ও কল্পনাকেই ধারণ করেছে শুধু। যেহেতু বিজ্ঞানের পথ সর্বদাই চলমান, যৌক্তিক ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় তাই বিজ্ঞান সাধারণত কোন পরম সত্যে বিশ্বাসী নয়। বস্তুর ভেতরের কার্যকারণ সম্পর্কের প্রাথমিক ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞান প্রথমে হাইপোথিসিস হিসেবেই প্রচার করে। পরবর্তি পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের প্রেক্ষিতে সেটা যাচাই বাছাই হতে হতে এক পর্যায়ে তা বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ধর্মতত্ত্বে পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন বালাই নেই। এটা কেবলই এক যুক্তিহীন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মগ্রন্থগুলোর কাহিনী বর্ণনায় এর জন্ম বা বর্ণনাকালীন সময়ে বিজ্ঞাননির্ভর সত্যের যেটুকু দেখা পাওয়া যায়, সময়ের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানধর্ম অনুযায়ী পরবর্তিতে তাও হয়তো মিথ্যা হয়ে গেছে নতুবা নতুন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অনড় ধর্ম যেহেতু যুক্তিহীন কিছু বিশ্বাস মাত্র, তাই পরবর্তি বাস্তবতায় এসে ধর্মীয় সত্যগুলো কিছু গাজাখোরি কাহিনীর মতো বিকলাঙ্গ হয়ে গেলেও ধর্মধ্বজাধারীরা সেটাকেই ধ্র"ব সত্য জ্ঞানে কতকগুলো অন্ধসংস্কারকে জীবনধারায় মিশিয়ে 'ইহাই পরম সত্য' বলে নিজের সাথে সাথে অন্যকেও প্রতারিত করে যাচ্ছেন। ফলে পরবর্তিকালে এসে ধর্মীয় সত্য আর বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে বিপরীতমুখি অবস্থান তৈরি হয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় ধর্ম এখন সত্যের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে নিশ্চিতভাবে। এ প্রসঙ্গে ধর্মীয় সত্য বনাম বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন ও নমূনা পাশাপাশি রেখে নিজস্ব কাণ্ডজ্ঞানটুকু খরচ করে যাচাই করলেই আমাদের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। আর এ কাজটাই বিস্ময়করভাবে অবিশ্বাস্য

দক্ষতায় করে দেখিয়েছেন একান্তই মাটিলগ্ন সাধাসিধে এক স্বশিক্ষিত ব্যক্তি আরজ আলী মাতুব্বর। আমাদের শহুরে-শিক্ষিত ভাষায় তিনি নিতান্তই একজন ব্রাত্যজন। কিন্ত জানার অদম্য কৌতূহলে শিক্ষা দীক্ষা জীবন যাপনে জাগতিক সমস্ত প্রতিকূলতায় আষ্ঠেপৃষ্টে জড়িয়ে থেকেও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র স্বীয় পরিচর্যায় কীভাবে জ্ঞানচেতনায় দার্শনিক বিভার উদ্ভাস ঘটাতে হয়, তা-ই দেখিয়েছেন আমাদের আরজ আলী মাতুব্বর। চোখ থাকলেই কি চক্ষুষ্মান হয়? প্রাতিষ্ঠানিকতার বড় বড় সার্টিফিকেটধারী তথাকথিত শিক্ষিত জন্মান্ধদের অবিমৃষ্য মূর্খতাকে দূর করার উপায় দেখানো জন্যে তিনি 'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি রহস্য' নামের যে দু'টো জাজ্জ্বল্যমান চোখ দান করে গেছেন, তুলনা বিচার হঠকারি হলেও, আমাদের মনে পড়ে যায় সেই সক্রেটিসের কথাই। তাই বুঝি এই আরজ আলী মাতুব্বরকে উদ্দেশ্য করে আরেক পণ্ডিতজন শ্রদ্ধেয় সরদার ফজলুল করিমের আবেগ-সঞ্জাত উক্তি- 'আমাদের সক্রেটিস' একটুও বাহুল্য মনে হয় না।

আমাদের লোক-দার্শনিক

আজ থেকে গুনে গুনে একশ' বছর আগে। রবীন্দ্রনাথ তখনো নোবেল পান নি। সেটা আরো পাঁচ বছর পরের ঘটনা। প্রচারিত জন্মসাল বিবেচনায় বাঙালীর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও বাংলাকাব্যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার অন্যতম অগ্রণী-পাণ্ডব কবি জীবনানন্দ দাশ উভয়েই তখন ন'বছরের কিশোর বালক। ঠিক সেই সময়ের সেই অন্ধকার সামাজিক অবস্থায় বরিশালের কোন এক গণ্ডগ্রামে অসহায় মা'কে নিয়ে আট বছর বয়েসী পিতৃহীন নিরক্ষর যে বালকটিকে 'দশ দুয়ারে সাহায্য' নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো সুযোগ যার কখনোই আসবে না এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেও যার নামটি উল্লেখযোগ্য হিসেবে কারো মুখেও উচ্চারিত হবে না, তাঁর নাম আরজ আলী মাতুব্বর। একান্তই গায়ে-গতরে খেটে খাওয়া অত্যন্ত সাধারণ এক মানুষের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কালের কালরেখায় অসাধারণ মানুষও যেমন সাধারণ হয়ে যায়, আবার খুব সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে ওঠে। তেমনি এক অসাধারণ হয়ে ওঠা মানুষের গল্প তাঁর নিজের মুখেই শুনি

'বরিশাল শহরের অদূরে লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম আমার ৩রা পৌষ, ১৩০৭ সালে। চার বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান, ১৩১১ সালে। আমার বাবার বিঘা পাঁচেক কৃষিজমি ও ক্ষুদ্র একখানা টিনের বসতঘর ছিলো। খাজনা অনাদায়হেতু ১৩১৭ সালে আমার কৃষিজমিটুকু নিলাম হয়ে যায় এবং কর্জ-দেনার দায়ে মহাজনরা ঘরখানা নিলাম করিয়ে নেন ১৩১৮ সালে। তখন স্বামীহারা, বিত্তহারা ও গৃহহারা হয়ে মা আমাকে নিয়ে ভাসতে থাকেন অকূল দুঃখের সাগরে। সে সময়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে আমাকে দশ দুয়ারের সাহায্যে।

তখন আমাদের গ্রামে কোনোরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো না। শরীয়তি শিক্ষা দানের জন্য জনৈক মুন্সি একখানা মক্তব খোলেন তাঁর বাড়িতে ১৩২০ সালে। এতিম ছেলে বলে আমি তাঁর মক্তবে ভর্তি হলাম অবৈতনিকভাবে। সেখানে প্রথম বছর শিক্ষা করলাম স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ তালপাতায় এবং বানান-ফলা কলাপাতায়, কেননা আমার বই-স্লেট কেনার সঙ্গতি ছিলো না। অতঃপর এক আত্মীয়ের প্রদত্ত রামসুন্দর বসুর 'বাল্যশিক্ষা' নামক বইখানা পড়ার সময় ছাত্রবেতন অনাদায়হেতু মুন্সি সাহেব মক্তবটি বন্ধ করে দিলেন ১৩২১ সালে। আর এখানেই হলো আমার আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষার সমাপ্তি বা সমাধি।

পড়া-লেখা শেখার প্রবল আগ্রহ আমার ছিলো। কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না। পেটের দায়ে কৃষিকাজ শুরু করতে হয় অল্প বয়সেই। আমার বাড়ির পাশে একজন ভালো পুঁথিপাঠক ছিলেন। কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি তাঁর সাথে পুঁথি পড়তে শুরু করি, বাংলা ভাষা পড়বার কিছুটা ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং উদ্দেশ্য আংশিক সফল হয় জয়গুন, সোনাভান, জঙ্গনামা, মোক্তল হোসেন ইত্যাদি পুঁথি পাঠের মাধ্যমে। এ সময়ে আমার পাড়ার দু'টি ছেলে বরিশালের টাউন স্কুল ও জিলা স্কুলে পড়তো। তাদের পুরোনো পাঠ্যবইগুলো এনে পড়তে শুরু করি ১৩৩৫ সাল থেকে এবং তা পড়ি ১৩৪৩ সাল পর্যন্ত। কেন তা জানি না, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদির চেয়ে বিজ্ঞানের বই ও প্রবন্ধগুলো আমার মনকে আকর্ষণ করতো বেশি। তখন থেকেই আমি বিজ্ঞানের ভক্ত।

আমার মা ছিলেন অতিশয় নামাজী-কালামী একজন ধার্মিকা রমণী। এবং তার ছোঁয়াচ লেগেছিলো আমার গায়েও কিছুটা। কিন্তু আমার জীবনের গতিপথ বেঁকে যায় আমার মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি দুঃখজনক ঘটনায়।

১৩৩৯ সালে মা মারা গেলে আমি মৃত মায়ের ফটো তুলেছিলাম। আমার মাকে দাফন করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মুন্সি, মৌলবি ও মুসল্লিরা এসেছিলেন, 'ফটো তোলা হারাম' বলে মায়ের নামাজে জানাজা ও দাফন করা ত্যাগ করে তাঁরা লাশ ফেলে চলে যান। অগত্যা কতিপয় অমুসল্লি নিয়ে জানাজা ছাড়াই আমার মাকে সৃষ্টিকর্তার হাতে সমর্পণ করতে হয় কবরে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে ছবি তোলা দূষণীয় হলেও সে দোষে দোষী স্বয়ং আমিই, আমার মা নন। তথাপি কেন যে আমার মায়ের অবমাননা করা হলো, তা ভেবে না পেয়ে আমি বিমূঢ় হয়ে মা'র শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদেহী আত্মাকে উদ্দেশ করে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, "মা! আজীবন ছিলে তুমি ধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা। আর আজ সেই ধর্মের নামেই হলে তুমি শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য। সমাজে বিরাজ করছে এখন ধর্মের নামে অসংখ্য কুসংস্কার। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, আমার জীবনের ব্রত হয় যেন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ অভিযান। আর সে অভিযান সার্থক করে আমি যেন তোমার কাছে আসতে পারি। তুমি আশীর্বাদ করো মোরে মা, আমি যেন বাজাতে পারি সে অভিযানের দামামা।"

আমি জানি যে, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীকরণ অভিযানে সৈনিকরূপে লড়াই করবার যোগ্যতা আমার নেই। কেননা আমি পঙ্গু। তাই সে অভিযানে অংশ নিতে হবে আমাকে বাজনাদার রূপে। প্রতিজ্ঞা করেছি যে, সে অভিযানে দামামা বাজাবো। কিন্তু তা পাবো কোথায়? দামামা তৈরির উপকরণ তো আমার আয়ত্তে নেই। তাই প্রথমেই আত্মনিয়োগ করতে হলো উপকরণ সংগ্রহের কাজে।

বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব ও বিবিধ বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য হয়ে সেখানকার পুস্তকাদি অধ্যয়ন করতে শুরু করি ১৩৪৪ সাল থেকে। স্বয়ং মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বলে যদিও ইসলাম ধর্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু তত্ত্ব জানার সুযোগ ছিলো, কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্সি, ইহুদি, খ্রীস্টান ইত্যাদি ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আমার জানার সুযোগ ছিলো না। তাই সেসব ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু জানার আগ্রহ নিয়ে পড়তে থাকি বরিশালের শংকর লাইব্রেরী ও ব্যাপ্টিস্ট মিশন লাইব্রেরীর কিছু কিছু বই। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের দর্শন বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেব জানতেন আমার

সাধনার উদ্দেশ্য কি। তাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হবে বলে তিনি আমাকে দর্শনশাস্ত্র চর্চা করতে উপদেশ দেন এবং তাঁর উপদেশ ও সহযোগিতায় দর্শনসমুদ্রের বেলাভূমিতে বিচরণ করতে থাকি ১৩৫৪ সাল থেকে। তখন দিন যেতো মাঠে আমার রাত যেতো পাঠে।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে দীর্ঘ ১৮ বছর সাধনার পর কতিপয় ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসকে দর্শনের উত্তাপে গলিয়ে বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢেলে তার একটি তালিকা তৈরি করছিলাম প্রশ্নের আকারে ১৩৫৭ সালে। এ সময় স্থানীয় গোঁড়া বন্ধুরা আমাকে ধর্মবিরোধী ও নাখোদা (নাস্তিক) বলে প্রচার করতে থাকে এবং আমার দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম ছেড়ে শহর পর্যন্ত। লোক পরম্পরায় আমার নাম শুনতে পেয়ে তৎকালীন বরিশালের লইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তাবলিগ জামাতের আমির জনাব এফ. করিম সাহেব সদলে আমার সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন ১৩৫৮ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমার বাড়িতে গিয়ে। সে দিনটি ছিলো রবিবার, সাহেবের ছুটির দিন। তাই তিনি নিশ্চিন্তে আমার সাথে তর্কযুদ্ধ চালান বেলা ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বরিশালে গিয়ে তিনি আমাকে এক ফৌজদারি মামলায় সোপর্দ করেন 'কম্যুনিস্ট' আখ্যা দিয়ে। সে মামলায় আমার জবানবন্দি তলব করা হলে উপরোল্লিখিত তালিকার প্রশ্নগুলোর কিছু কিছু ব্যাখ্যা লিখে 'সত্যের সন্ধান' নাম দিয়ে তা জবানবন্দিরূপে কোর্টে দাখিল করি তৎকালীন বরিশালের পুলিশ সুপার জনাব মহিউদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে, ২৭শে আষাঢ়, ১৩৫৮ সালে (ইং ১২. ৭. ৫১)।

'সত্যের সন্ধান'-এর পাণ্ডুলিপিখানার বদৌলতে সে মামলায় দৈহিক নি®কৃতি পেলাম বটে, কিন্তু মানসিক শাস্তি ভোগ করতে হলো বহু বছর। কেননা তৎকালীন পাকিস্তান তথা মুসলিম লীগ সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিলেন যে, 'সত্যের সন্ধান' বইখানা আমি প্রকাশ করতে পারবো না, ধর্মীয় সনাতন মতবাদের সমালোচনামূলক অন্য কোনো বই লিখতে পারবো না এবং পারবো না কোনো সভা-সমিতিতে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বমত প্রচার করতে। যদি এর একটি কাজও করি, তবে যে কোনো অজুহাতে আমাকে পুনঃ ফৌজদারিতে সোপর্দ করা হবে। অগত্যা কলম-কালাম বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হলো ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। এভাবে নষ্ট হয়ে গেলো আমার কর্মজীবনের অমূল্য ২০টি বছর।

বাংলাদেশে কুখ্যাত পাকিস্তান সরকারের সমাধি হলে পর 'সত্যের সন্ধান' বইখানা প্রকাশ করা হয় ১৩৮০ সালে, রচনার ২২ বছর পর। তারপরে আমার লিখিত বই 'সৃষ্টি রহস্য' প্রকাশিত হয় ১৩৮৪ সালে, 'স্মরণিকা' ১৩৮৯ সালে এবং 'অনুমান' নামের ক্ষুদ্র একখানা পুস্তিকা ১৩৯০ সালে। এ প্রসঙ্গে সভাসীন সুধীবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার লিখিত যাবতীয় পুস্তক-পুস্তিকাই হচ্ছে আমার মায়ের মৃত্যুদিনে আকাঙ্ক্ষিত 'দামামা'র অঙ্গবিশেষ।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, আমি ধর্মের বিরোধিতা করছি। বস্তুত তা নয়। পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সমস্ত জীবের এমনকি জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি পদার্থেরও এক একটি ধর্ম আছে। ধর্ম একটি থাকবেই। তবে তার সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থাকা আমার কাম্য নয়।

মানব সমাজে ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিলো মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যই। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ধর্মগুলো মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই করছে বেশি, অবশ্য জাগতিক ব্যাপারে। ধর্মবেত্তারা সকলেই

ছিলেন মানবকল্যাণে আত্মনিবেদিত মহাপুরুষ। কিন্তু তাঁরা তাঁদের দেশ ও কালের বন্ধনমুক্ত ছিলেন না। তাঁদের প্রবর্তিত সেকালের অনেক কল্যাণকর ব্যবস্থাই একালের মানুষের অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই ধর্মীয় সমাজবিধানে ফাটল ধরেছে বহুদিন আগে থেকেই। সুদ আদান-প্রদান, খেলাধুলা, নাচ-গান, সুরা পান, ছবি আঁকা, নারী স্বাধীনতা, বিধর্মীর ভাষা শিক্ষা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ধর্মবিরোধী কাজগুলো এখন শুধু রাষ্ট্রীয় সমর্থনপুষ্টই নয়, লাভ করেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বিশেষত গান, বাজনা, নারী, নাচ ও ছবি Ñ এ পাঁচটির একত্র সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশনে। কিন্তু সেসবের বিরুদ্ধে সনাতনপন্থীরা কখনো প্রতিবাদের ঝড় তোলেননি। অথচ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন ফজলুর রহমান, বযলুর রহমান, আ. র. হ. এনামুল হক, আবুল ফজল প্রমুখ মনীষীগণের দু'কলম লেখায়। কতকটা আমারও।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে ধর্ম হোঁচট খাচ্ছে পদে পদে। কোনো ধর্মের এমন শক্তি নেই যে, আজ ডারউইনের বিবর্তনবাদ বাতিল করে দেয়, নাকচ করে মর্গানের সমাজতত্ত্ব এবং ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করে কোপার্নিকাস-গ্যালিলিওর আকাশ তত্ত্ব, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে।

মধ্যযুগে যুগমানবের আসনে সমাসীন ছিলেন তৎকালীন মুনি-ঋষি ও নবী-আম্বিয়ারা। তাঁরা ছিলেন গুণী, জ্ঞানী ও মহৎ চরিত্রের মানুষ, তবে ভাববাদী। তাঁদের আদেশ-উপদেশ পালন ও চরিত্র অনুকরণ করেছেন সেকালের জনগণ এবং তখন তা উচিতও ছিলো। কিন্তু সেই সব মনীষীরা এযুগের মানুষের ইহজীবনের জন্য বিশেষ কিছুই রেখে যাননি, একমাত্র পারলৌকিক সুখ-দুঃখের কল্পনা ছাড়া।

এ যুগের যুগমানবের আসনে সমাসীন আছেন Ñ কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা। এঁরা সবাই এযুগের গুণী, জ্ঞানী ও মহৎ চরিত্রের মানুষ। তবে এঁরা হচ্ছেন মুক্তমন, স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ও বাস্তববাদী। এঁদের অবদান ছাড়া এ যুগের কোনো মানুষের ইহজীবনের এক মুহূর্তও চলে না। তাই এঁদের সম্মিলিত মতাদর্শ আমাদের মস্তকে গ্রহণ করা উচিত ভাববাদের আবর্জনার বোঝা ফেলে দিয়ে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানবিরোধী কোনো শিক্ষাই গ্রহণীয় নয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এঁদের সম্মিলিত মতাদর্শ কি? এক কথায় তার উত্তর হচ্ছে মানবতা। হয়তো ঐ মানবতাই হবে আগামী দিনের মানুষের আন্তর্জাতিক ধর্ম তথা 'মানবধর্ম'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় (যে সভাটি কোনো কারণবশত অনুষ্ঠিত হয়নি) পাঠ করার জন্য আরজ আলী মাতুব্বরের লিখিত ভাষণের নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করা হলো এ জন্যেই যে, আমরা তাঁর ঘটনাবহুল জীবন ও তাঁর গড়ে ওঠা চিন্তাজগতের একটা রূপরেখা এ থেকেই পেয়ে যেতে পারি। তবে তাঁকে বুঝার সাথে সাথে আমাদের নিজেদের জীবন জগৎ ও চলমান অন্ধত্বের স্বনির্মিত দার্শনিক জটিলতা কুটিলতাগুলো বুঝতে হলে তাঁর রচনাবলীর গভীর পাঠ আমাদের জন্য আবশ্যক ও জরুরি বলেই মনে হয়। চোখ থাকলেই যে চক্ষুষ্মান হওয়া যায় না, আরো কিছু থাকতে হয়, সেটাই আরজ আলী মাতুব্বর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। সক্রেটিসের মতোই সেই কঠিন প্রশ্ন-করার উপায় আবারো বাৎলে দিলেন 'কেন?'

এবং মৃত্যুর আগে তাঁর চুরাশি বছর বয়সে আরেকটি যে অসাধারণ কাজ করে গেলেন তিনি, তাঁর ভাষ্যেই শুনি

'... মৃত্যুর পরে আমার চক্ষুদ্বয় চক্ষুব্যাংকে এবং মরদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে দান করেছি। উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ।' #

রণদীপম বসু, ঢাকা, বাংলাদেশে বসবাসরত লেখক। ইমেইল - ranadipam@yahoo.com